সুবল দত্তর গল্প

পলাশ ডাবরের আগুন পলাশ বন রজনির কাছে আসে

If that's how it has to die, go ahead and kill it

– Bahti

জায়গাটা খুব চেনা। বহু বছর ধরে চেনা। তাও প্রায় ঘুরে ফিরে পাঁচশো বার তো বটেই। তবু ধন্ধ লাগে রজনির। গা গস্‌গস্‌ করে। ক্লান্ত লাগে। ঘরে ফেরার একদম ইচ্ছে নেই। ফিরতে হয় তাই ফেরা।

কমলকাটার রক্ত পলাশের জঙ্গল লাইন দিয়ে এখানে থেমেছে। পলাশ ডাবর নাম। বসন্তকাল কিন্তু এখানে কোকিল ডাকে না। অনেকগুলো গলি। গলির বাঁকে বাঁকে দুচারটে ছায়া ছায়া মানুষ। ভাবলেশহীন মুখ। কেউ কাউকে দেখছে না। স্থির নিস্পন্দ। সবাই যেন ছায়া ছায়া। এই আছে, এই নেই। গলির বাঁকগুলো পেরোতে পেরোতে রজনির গায়ে বন্ধন মুক্তির বাতাস গায়ে লাগে। যেন টাটকা দীর্ঘশ্বাস মামরকুদরের বাঁকে এক জলশূন্য ডোবা। বিশাল এক গোলাকার গর্ত। যেন কোনো সময়ে অসাধারণ উল্কাপাত হয়েছিল। এখানে অন্ধকার। এখানেই আলো এসে থামে। যেন সৃষ্টির অঙ্কপ্রণালীর ছন্দ পতন ঘটেছে। গা ছমছম করে। হাওয়া ঘুরপাক খায়। দৃশ্য আর দৃশ্য থাকে না। মাঠঘাট পাখপাখালি সবই যেন ছায়া ছায়া।

মামরকুদরের পাকা রাস্তা সরু হতে হতে মনকচিতা। মনকচিতায় নেমেই পথ বেদম সরু হয়ে আবছা হয়ে পথহীন। তারপর অদ্ভুত নিচু দেওয়াল। বহু পুরোনো পাথরের দেওয়াল। এটি প্রায় এপিগ্রাফ। তাতে নানা হিজিবিজি আঁক। যেন বার্লিনের দেওয়াল। তাতে যার যা খুশি আক্রোশ। পাঁচিলের এপারে এক পঞ্চায়েত। অন্য পারে অন্য। পাঁচিলটা খুব একটা উঁচু নয়, লম্বাও নয়। পাঁচিল ডিঙিয়ে বাতাস এপারে আসছে গুঙিয়ে। করুণ আওয়াজ। যেন শত শত শোকের মিছিল। রজনির বউ ভয় পায়। রজনির কাছে ঘেঁষে আসে। রজনি বৌকে বাঁ হাত দিয়ে কাছে টানে। পাঁচিলে ওপাশে উঁকি দেয়। এক মস্ত লম্বা লালমাটির

খাই। তার পিছনে পলাশ ডাবরের আগুন জঙ্গল দেখা যায়। রজনির বৌ আরো ঘনিষ্ঠ হয়।

— কি হল্য! ডরাছিস্ কেনে? হামি আছি ন! হ্যাঁঃ!

রজনির বৌ ফুলকুমারি আঙ্গুল বাড়িয়ে দ্যায় পাঁচিলের এক কোণে। সেখানে স্তূপীকৃত অনেকগুলি ছোটো ছোটো পোড়ামাটির ঘোড়া। হাওয়া যেন রণ দুন্দুভি বাজাতে বাজাতে সেখানে ঘুরপাক খাচ্চে। চারদিকে হাহা শূন্যতা অথচ যুদ্ধের পরিবেশ।

রজনি দেখল ঘোড়াগুলোকে পাক খেয়ে একটা বেশ বড়োসড়ো সাপ। — ধুর্ ক্যালা। উটায় কি কইর্ব্যাক? ডাঁড়া টুকু। উটাকে খেদ্ছি হামি। উটাকে খেইদ্-ব আর ওইখেনটাতেই বইস্ব। তুই দাঁড়া টুকু।

রজনি হাত তালি দিতে দিতে মুখে হুস্ হুস্ শব্দ করে সেদিকে এগিয়ে গেল। সাপটা পাক খুলে খস্ খস্ শব্দ করে পাঁচিলের ওপারে চলে গেল। রজনি বৌকে টেনে আনল। ঘোড়াগুলো সরিয়ে বসার জায়গা করে বসল।

রজনি দেখল, তারই হাতের গড়া প্রায় শ দেড়শ মাটির ঘোড়া। একটু সিঁদুরের আভাস। কখনো পুজো পেত। এখন পরিত্যক্ত। রজনির দীর্ঘশ্বাস। প্রকৃতি পরিবেশ তার জীবনধারার পতনের দিক নির্দেশক। বহুদিন হয়ে গেল, তার এই বৃত্তি সমাজ কেড়ে নিয়েছে। ঘোড়াগুলোকে দেখে তার শরীরে আবার রাগ চাপতে থাকে। সে কোমরে গোঁজা দেশলাই বার করে। বিড়ি ধরায়। আরামসে সুখটান দিতে থাকে।

— তোর ডর নাই?

ফুলকুমারি তখনও ত্রস্ত। নুয়ে আছে তবু বসছে না। রজনির হ্যাঁচকা টানে ফুলকুমারি রজনির কোলে। রজনি তার সারা গায়ে হাত বোলায়।

— কিসের ডর?

— স্যাঁপের!

— ধুর্। ই সাঁপ, ই সাঁপ হামার কি কইর্ব্যাক!

হামাকে ই সাঁপগুলানে চিনে। তব্যা হঁ। সাঁপ দেখল্যম্ মুখিয়ার ঘরে। সাঁপ দেখল্যম্ পঞ্চায়েত অফিসে। সাঁপ ছিল ব্যাংকে... শেষের কথা খস্খসে হয়ে যায়। ফুলকুমারি দেখে রজনির মুখ চোখ আস্তে আস্তে কঠিন। ফুলকুমারির নগ্ন উরুতে হাত থেমেই থাকে। ফুলকুমারির খুব ভয় করে। রজনির হাত ধরে ঝাঁকাতে থাকে।

— ক্কি! ঘর যাবি নাই, নাকি? উখেনে য়া হবার ত হল্য। এখন চ ঘর চ।

— আঃ বইস্ন। যাবি কুথায়? ঘরে ত শুবার জায়গা নাই। ইখ্যানটার মতন বৃন্দাবন আর কুথায় পাবিস্? হ্যাঁঃ?

ফুলকুমারির ভয় তখন আশ্বাস পেয়ে আবেগে কোথায় উড়ে গেল। শন্ শন্ বাতাস বইছে। নাই বা কোকিল। নাই বা এখানে আমের মঞ্জরীর মাদকতা। এই অসম্ভব নির্জনতায় ফুলকুমারির বসন্তের প্রত্যক্ষ বোধ হল।

ঘরে তো ভিড়। ছেলেমেয়ে শ্বশুরশাশুড়ি। অন্তরঙ্গ হবার উপায় নেই। নিচুচালার ঘর। তিন বছর ঘরের চালা ছাওয়া হয়নি। বাতাস বইলে চালার খড় ধুলো হয়ে উড়তে থাকে। তিন বিটি। ঋণের দায়ে টাকা শোধ করতে না পারায় তিন মাসের ঘানি টানতে গেছল রজনি। রাঁচির জেলে। ফিরে এসে দুদিনের মধ্যেই আবার ঝামেলা। এবার ও পালাবে তো কোথায় পালাবে? ফুলকুমারির বুকে আবার একের পর এক পাথর চাপতে লাগল। হতাশার একটা খেই টানলে পরপর অনেকগুলো চলে আসে। পঞ্চায়েত ভবনে যখন দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে রজনি ছুটে গিয়ে মাঠ থেকে একটা আধলা ইঁট কুড়িয়ে নিয়ে এসে সজোরে মুখিয়ার মাথায় ঠুকে দিল আজ, তারপর তার হাত ধরে টানতে টানতে দৌড় লাগাল, সেই সময় ফুলকুমারির হঠাৎই যেন মনে হয়েছিল তার জীবনযাত্রার একটা বন্ধ দরজা খুলে গেছে। রজনি যেন তার বুকে একটা বিশাল চাপা পাথর। সেটা যেন সরে যাবার একটা ইঙ্গিত। কিন্তু এই যে উন্মুক্ত বসন্ত। রজনি সমানে তালে তালে তার বিবশ শরীরে চন্দন কাঠ ঘষে চলেছে, এই অনুভবের অভাববোধ তাকে আবার হতাশ করে তুলল। রজনি না থাকলে তার যৌবনকালের কোনো মানে হয় না।

নানান সাত পাঁচ চিন্তায় তার শরীরে ছড়িয়ে পড়া আবেশজাল টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। জোড়া লাগাতে চাইলেও আর হচ্ছে না। রজনির মুখ থেকে মুখ সরিয়ে তার ঘষাঘষা কথা — এই ত অপরশু (পরশুর আগের দিন) জেল ল্যা ঘরে আলি। কেনে খামকা উয়াদের সঙ্গে হুজ্জুত! আঃ আমার মুখটা চিপ্‌ছিস কেনে? এখন বইল্‌ব নাই বলছিস্? ত লে।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফুলকুমারি চিন্তামগ্ন হয়ে গেল। আবার কত দিনের জেল? যদি ফাঁসি হয়? কী হব্যাক ছেল্যা গুলানের?

মুখে বলতে না চাইলেও মুখ থেকে বেরিয়ে যায় — হ্যাঁ দেখ্। যদি উ উ মর‍্যে যায়? কী করবি? কুথায় যাবি?

রজনি তখন চরমে। তাই এক হাত দিয়ে ঠাস করে ফুলকুমারিকে এক চড়। ফুলকুমারি পা জড়ো করে নেয়। নিজেকে গুটিয়ে নেবার চেষ্টা।

— মার, মার, হামাকে আর-অ মার। ওইটাই ত পারিস! তর বুদ্ধি ত নাই। হে ভগবান! ফাঁকা গুনা টাড়্যে হামাকে কী কইরছে দেখ মরদে!

রজনি একসময় থামে। নেতিয়ে যায় মাটির তালের মতো। কিছুক্ষণ নিঃশব্দ।

হাওয়াও আর গোঙায় না। একটা চিলের ছায়া ওদের নগ্ন শরীর দ্রুত ছুঁয়ে যায়। ফুলকুমারি ফিস্ ফিস্ করে বলে ওঠে — তুঁই ত কন্হ দিন বিপিএলের পইসা পাবি নাই ব্যাংক ল্যা। তব্যা সংসারটা চইল্ব্যাক কী কর্যে। মাটির ঘঁড়া হাতি করবিস্ কি কর্যে! ঘরেই ত থাকবিস্ নাই। তুঁই ত আসামী। কত-অ দিন লুকাঁই লুকাঁই ঘর্যে বুইল্বি? তর কিসে প্যাট চইল্ব্যাক? হামাদের কিসে প্যাট চইলব্যাক! চোখ খুলে রজনির চোখে চোখ মিলায় ফুলকুমারি। ঢোঁক গিলে পরিষ্কার গলায় বলে ওঠে —উয়ারা বইলছিল, হামার বিপিএল খাতাটো খুল্যে দিব্যাক ... যদি তুঁই... যদি তুঁই ...

রজনি গলে গিয়েছিল। ক্রমে সে বাষ্পীভূত বসন্তের হাওয়ায়। কিন্তু হঠাৎ করে শক্ত লোহা। এক ঝটকায় নিজেকে সরিয়ে সবলে লাথি কষায় ফুলকুমারিকে। এবং আবার।

— বুর মাগি। মাথা খারাপ! তুঁই হামাকে মরতে বইলছিস? তর বিপিএলের খাতা খুইলতে হামি মইরব? হামি মইরল্যাই তর বিপিএলের পইসা পাবি?

ফুলকুমারির কোমর অব্দি উদোম। চিৎ হয়ে ওমনিই পড়ে রইল। নির্লিপ্ত। রজনির চোখ থেকে আগুন ঝরে। মুখ থেকে কেবল খিস্তি।

— শালারা হামাকে মইরতে বইল্ছে? শালাদের যেমন বাপ ম বহিন নাই? শালারা হামাদিগ্কে মইরতে বইলছে। শালারা সবাইকে— সব গরিবগুলানকে মইরতে বইলছে। উয়াদের মাকে উয়াদের বাপ্কে .....

মন্ত্রের মতন অভিশাপ উড়তে লাগল বাতাসে। বসন্তের বাতাস। ফুলকুমারি তখন উঠে বসেছে। চোখে এক ফোঁটা জল নেই বরং আগুন ঝরছে। চোখ দুটি যেন আগুন রঙের পলাশ। রজনি আবার পা দিয়ে ওকে ঠেলে দিতেই ফুলকুমারির মুখে তুবড়ি ছুটতে লাগল। গালিগালাজ।

— হামি তর সঙ্গে নাই ঘর কইরব। তুঁই হারামি, এত দিন লে কামিন খাট্যে তর বিটিগুলানকে তর বাপ মাকে খাওয়াল্যম পরাল্যম আর আইজ তুই হামাকে গড়াল্লি? নিকম্মা কুথাকার! চয়াড় কুথাকার! পচ্ করে থুতু ছুঁড়ল ফুলকুমারি রজনির দিকে। পেটের তলায় খুঁটে বাঁধা একটা ইঞ্চ্ স্ট্যাম্প প্যাড্ বার করে ছুঁড়ে দিল।

— ল্যা তর টিপা ছাপ্ট। তর তরেই হামি চুরি কর্যে আন্যেছিলম্ পঞ্চাইত আপিস লে। ইখেনে বস্যে বস্যে যত পারবিস্ ঠেপা ছাপ দিয়েঁ মর। হামি যাচ্ছি। হামি কামিন খাট্যে হামার প্যাট হামি লিজেই চালাই লিব। তর সাথে হামি নাই ঘর কইর্ব।....

ফুলকুমারি চিৎকার করে আরো কিছু বলতে বলতে দৌড়তে লাগল উন্মুক্ত

মাঠে। পলাশ ডাবরের জঙ্গলের দিকে। রজনির চোখের সামনে সে ছোটো হতে হতে প্রায় মিলিয়ে গেল। রজনি টের পেল সে একা। এই বিশাল প্রান্তরে সে বন্দি। কোথাও যাবার নেই। কোথাও যাবার উপায়ও নেই। রজনির বোধ হল অনেকগুলো ঘোড়া নিয়ে সে একা যোদ্ধা। লুঙ্গি ঢিলে করে কোমরে দলা পাকানো ব্যাংকের একটা ওপেনিং ফর্ম বার করল। সেটা সোজা করে খুব ধীরে ধীরে পাসপোর্ট সাইজের ফটো উঠিয়ে ফেলল। মুখিয়া বলেছিল, মোচটা কামাই লিবি, একটা গামছা মাথায় বাঁধবি আর ফটো তুলাবি। তকে কেউ চিনতে পাইর্‌বেক নাই তুই রজনি বঠিস্‌। তর নামটা বদলাঁই দিব। তর নাম হব্যাক রঞ্জন মাহাত। ঠিকানা— মনকচিতার টাঁড়। তোর নাম বিপিএলে উঠাই দিব। ব্যাংকে খাতা খুলাই দিব। শুধু বাদ্যের ক্ষেতট হামার নামে কর্‌্যে দ্যা। তোর বাপের নামটাও দুসরা কইরত্যে হবেক। কী নাম দিব তর বাপের? কে হব্যাক তর বাপ?

কথাটা মনে হতেই রজনির গা গরম হয়ে গেল। বেলা পড়ে আসছে। পাঁচিলটার নিচে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে! রজনি হঠাৎ একাই জোরে চেঁচিয়ে উঠল।

— শুঁয়োর। তুঁই কুকুর! বলছিস্‌ কী— হামার বাপের নাম দুসরা কর্‌্যে দিবি! হামার বাপ্‌! হামার বাপ, দুসরা? হামার বাপ দুটা? হামি হারামি কি তুঁই? হামার বাপের নাম দুসরা কইরত্যে তুঁই হামার জমিনটা তর লিজের নামে করত্যে চাইছিস? হামার কাছ লে পয়সা মাঙ্গছিস্‌! শালা ভিক্‌মাঙ্গা! ঠিকেই কইর্‌্যেছি। তর ইঁট ছেঁচেছি। একবার তুঁই চোর বললি? হামি ত কিছু বলি নাই। ম্যানেজারটো হামাকে গাল দিল। শুয়োর বলল চোর বলল — দেখলি ত? উয়ার মাথায় ডাঙ্গ মার্‌্যে জেল খাইট্‌লম? কে ঘুষ খান্য! কে চোর? হামি কি তরা? তুই চোর— তুই চোর ... চোর ... চোর ...

রজনির জেহাদ্‌ বাতাসে মিলিয়ে যায়। প্রতিধ্বনি হয় না। মনে পড়ে বছর পাঁচেক আগের ঘটনা। মুখিয়ার তোড়জোড়। বেশ কয়েকজনকে লাইন বন্দি করে ব্যাংকে খাতা খোলানো। সরকারের আদেশে কুড়ি হাজার টাকা করে লোনের বন্দোবস্ত করে দেওয়া। কুড়ি হাজার টাকা নগদ চোখের সামনে বাঁদরের পিঠে ভাগ হয়ে গেল। পেল সে মাত্র পাঁচ হাজার। হাতের টিপ্‌ ছাপের কালি মুছতে ভাটিখানায় বোতলের মদে হাত ধোয়া। পাঁচশ টাকার মদ মাংস খেয়ে বাড়ি ফেরা। তার পরদিন দুহাজার টাকার দেনা শোধ। হ্যাঁ। ফুলকুমারিকে একটি শাড়ি সে কিনে দিয়েছিল। তার জন্যে বাপ মার গালি সহ্য করতে হয়েছে। মুখিয়া বুক ঠুকে বলেছিল — তোদের ভয় নাই। হামি আছি। তোদের লোন শোধ করতে হব্যাক নাই। ই লোনটা এমনই বটে। তারপর .... বেশ চলছিল মাটির হাঁড়ি তৈরি

আর মাটির ঘোড়া বানানোর কাজ। দু পয়সা হচ্ছিল বেশ। গরিবের সংসার হল বহতা নিকাশির জল। ঝিরঝির বইতে থাকে তো বেশ। থেমে গেলেই পচা নর্দমা। গেল বছর গাঁয়ে ফসল উঠল না। খরা পীড়িত অঞ্চল ঘোষণা হয়ে গেল। সেই বছরেই ব্যাংক থেকে হাঁক ডাক। চিঠি পত্তর। ধমক্। মুখিয়া বলে হামি কী কইর্ব? তুঁই লোন লিয়েছিস্। তুঁয়েই বুঝ? হামাকে গ্যারেন্টার কর্যেছিস্। হামার কন অ হল্যে তকে হামিই না ধইর্ব? হামি কন - অ দোষের মধ্যে নাই। হামার কন-অ হল্যে হামিই না তকে ধইর্ব? লোন লিয়েছিস্ তুই— তুঁয়েই বুঝ!

দেখা গেল, ঘর ও ঘরের যাবতীয় বিক্রি করেও সুদে আসলে সাবসিডি মিলিয়ে পঁচিশ হাজার টাকা হচ্ছে না। মুখিয়া এর মধ্যে তার মাথা খারাপ করতে লেগেছে। তার দাবি, যে ক্ষেতটাতে ফসল ফলে না, সেই বাদের ক্ষেতটা তার নামে লিখিয়ে দিলে যে কিছুটা ম্যানেজ করতে পারবে।

ঘোড়া সৃষ্টিকার লড়াকু রাগটা রজনির ভিতরে থেকে থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। পঞ্চায়েত ভবন থেকে বার কয়েক ব্যাংকে যাওয়া আসা, ব্যাংকের ম্যানেজারের চোখ রাঙানো তার আর সহ্য হল না। দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে যা কাণ্ড করে বসল তাতেই তিনমাসের ঘানি। তবু ভালো। জেল মানে যা লোকে ভাবে রজনি সেখানে গিয়ে দেখেছে, থেকেছে, তা নয়। বর্ধমানে যেমন কুলি মজুর খাটতে যেত কম বয়েসে, তেমনিই লেগেছে রজনির। ভালোই লেগেছিল রজনির। কিন্তু এবারে? একটু যেন শীত শীত করছে। হাত দিয়ে গাটা ঘষতে গিয়ে টের পেল রজনি সারা গা ঘমে ভিজে গেছে।

Sighs rising and trembling through the timeless air

– Dante

দূরে পলাশ ডাবরের পলাশ জঙ্গল যেন দিগন্তে এক বিশাল সাঁঝা চুলহা। যেন এই বিশাল উনুনে সন্ধ্যেবেলায় রুটি সেঁকা হবে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অভুক্ত সব বিপিএল কার্ডধারীরা দরিদ্রসীমার নিচের ছায়া ছায়া মানুষেরা এই আছে এই নেই নিশ্চুপ জনেরা সেই উনুনে সরকারি অনুদান পাবার আশাগুলি সেঁকে নেবে।

রজনি ঘোড়ার স্তূপে চড়ে বসে। দু একটা মটমট করে ভেঙে গেলেও কি জানি কেন রজনির বসতে ভালো লাগলো। নিজেকে ঘোড়ার দেবতা তালবাসিনী ভগবান বলে মনে হলো।

রজনি বিড়ি ধরায়। বৌটা পালিয়ে যাবে কোথায়? ঘরেই ফিরবে। ওর কোমরের গুন্সিতে দশটাকা আছে। তালডোবরার মোড়ে চাল কিনবে। আর একটু নুন। ওর কিছুই হবে না। কামিন খেটে সংসার চালিয়ে নিবে। তফাতটা এই।

লাল কার্ডে তার বাবা আর মা চাল পাচ্ছিল সরকার থেকে। চার টাকা কেজি। এখন আর চাল দেবে না। বিপিএলের খাতা খুলিয়ে তাতে কিছু টাকা জমা করবে। তোমরা আর চাল পাবে না। হয় ব্যাংকে নয় পোস্টাপিসে খাতা খোলো। পয়সা পাবে। কিন্তু ঋণগ্রস্ত রজনি তাও আবার জেল ফেরত, তার পুরো পরিবার ঘর সমেত ব্যাংকে বন্ধক। বিপিএলের জন্য ব্যাংকে কীভাবে খাতা খোলানো যায়? সংসার কীভাবে চালানো যায়? নাঃ আর ভাবতে পারছে না রজনি। লড়াই চাই। কিন্তু কার সাথে? প্রস্তর প্রাচীরের ওপাশে তাকায় রজনি। বিশাল গর্ত খুঁড়ে রেখেছে মনরেগা। পাঁচ গ্রামের পাঁচ মুখিয়ার কাজ। গর্ত খোঁড়া আর সেই মাটিতে নিজেদের অনাবাদী জমিগুলো উঁচু করা। মস্ত বড়ো হাইওয়ে রোড যাবে পাঁচ গ্রামের মাঝ দিয়ে। তার আশেপাশের জমিগুলো প্রোমোটার কিনবে চড়া দামে। তাই মাটি ভরাট। তাই পৃথিবীতে এই ক্ষত। রজনি সবই বোঝে।

দূর থেকে পলাশ ডাবরের লাল জঙ্গল দেখে রজনির মন ফের আনচান করে ওঠে। মন বলে — রজনি, তুঁই ইখ্যানে কী করছিস? মুখিয়াটোকে তুঁই ত ঠুক্যে মারলিস্। ধরা পইড়লেই তর ফাঁসি। ভাগ্ রে রজনি ভাগ্। জঙ্গলে যা। পালা। জঙ্গলে জঙ্গলে দেশ ছাড়। ভিটা ছাড়। মাগ্ ছাড়। পরিবার ছাড়। আবার রজনি ঘুরে দাঁড়ায়। নাঃ হামি যদি এক বাপের বেটা। ত হামি কুথাও যাব নাই। ইখেনেই থাইক্‌ব। দেখি কার বাপ কী করে।

কথাগুলো বেশ জোরে জোরে বলে রজনি চুপ করে প্রতিধ্বনির আশায় থাকে। কিন্তু প্রতিধ্বনি হয় না, হাওয়া সমানে গোঁঙাতে থাকে। পাঁচিলের ওপার থেকে বাতাস এসে রজনির চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকে।

রজনি ফের চেঁচিয়ে ওঠে। — হামি ঠিকেই কর‍্যেছি। উয়াকে হামি ইঁট দিয়ে ছেঁচে গেধ্‌লা কর‍্যে দিঁয়েছি। হামি ঠিক কর‍্যেছি। হামার জমিতে লালচ? হামার কাছ লে পইসা লিয়ে হামাকেই ফাঁসাল্য? হামাকেই জেলে পাঠাল্য! উয়ার নিজের জনমের কন-অ ঠিক নাই, বুলছ্যে, তর বাপের নামটা হামি বদলাব? তর বিপিএল— তুঁয়েই রাখ্। অমন বিপিএলের হামার কী কাজ? হামার বউটাই হামাকে ছাড়্যে চলে গেল। বাপ ভাতারি। হামার দুঃখের সময় হামাকে ছাড়্যে দিল, হামার বিপিএলের কী কাজ? তর দু নম্বরি ব্যাংকের খাতায় এই—এই হামি পিসাব করছি। হ্যাই দ্যাখ্। হাঁই ভাল্। হামি পিসাব করছি। রজনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার স্তূপের ওপর পেচ্ছাপ করতে থাকে। পেচ্ছাপ করে আর দু হাত তুলে নাচতে থাকে, গাইতে থাকে —

হামি কী বইল্‌ব হে অগতির গতি
হামি বুইঝ্‌তে লারি মানুষজনার জাত পিরীতি

তাই হামার মন বাসনা ...

ভদ্রলোকের ঘঁড়ার মুখে মুতি ... হি হি হি ...

রজনি গানের শেষের লাইন নিজের মনোমত প্যারোডি করে হি হি করে হাসতে লাগে আর পেচ্ছাপ করতে থাকে। তান ধরে, পা দিয়ে ঠোকা মারে। গান গায় আর হাসতে থাকে।

দু একটা ঘোড়া ছিটকে ছিটকে পড়ে। হঠাৎ পায়ে ভারি ও ঠাণ্ডা কিছুর অনুভব। তীব্র ছুঁচ ফোঁটার জ্বালা। আধো অন্ধকারে ঠিকমতো ঠাহর করা যায় না। একটু ঝুঁকে পড়ে রজনি দেখে সেই সাপটি। এঁকে বেঁকে সর সর করে ঘোড়াগুলির আড়ালে পাঁচিলের ওপারে পালিয়ে যাচ্ছে। পায়ের যন্ত্রণা ভুলে যায় রজনি। প্রচণ্ড রাগে সারা শরীর গরম হয়ে ওঠে। হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। খপ্ করে সাপের মাথাটা চিপে ধরে। সাপটা তার হাত পেঁচিয়ে ধরে। শক্ত হয়। তত বেশি শক্ত হয় রজনির মুঠো। দুহাতে পিষতে থাকে সাপের মাথা।

— শালা, হারামি! তুঁই! তুঁই-ও মুখিয়ার মতন খল? হামি ত .. কন-অ দোষ করি নাই! তব্যা? কেনে কামড়ালি হামাকে? উয়াদিগ্‌কে কামড়াতিস্ ত বুইঝ্‌তম। শয়ে শয়ে লেপার গুলান (কুষ্ঠরোগী), ভিখ্‌মাংগাগুলান লাইন দিঁয়ে সকাল ল্যা দাঁড়াইছিল। কারোর খাতা ব্যাংকে খুলায় নাই। যারা বলল্য, ইটা নাই উটা নাই, হব্যাক নাই। উয়াদিগকে কাটিস্ না কেনে? শালা, হামাকে কামড়াবি? হামাকে কমজোর পালি? ভিক্‌মাংগারা বিপিএলের টাকা পাবেক্ নাই ত কি উয়ারা কামাবেক্। তুঁইও গরিবের লহিস্ রে। তুঁইও হারামি। তর বাপকে ... তর মাকে ....

শ্বেতবর্ণ, নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ .... ক্রোশ প্রমাণ, যোজন প্রমাণ, অশ্বাকার ... মহাকায় ... মহাবল পরাক্রান্ত ... শত শত ... সহস্র সহস্র ..... অর্বুদ অর্বুদ..... বহুবিধ মহাবিষ বিষধরগণ... সেই প্রজ্জ্বলিত হুতবহ মুখে পতিত হইতে লাগিল..... (সর্পযজ্ঞারম্ভ / মহাভারত)

রজনি তীব্র বিষের প্রদাহ অনুভব করে ডান পা ... কোমর .. নাভীমূলে। কিন্তু শক্ত মুঠো আরো শক্ত করে। ছাড়ে না। সারা শরীরে শিরশিরানি অনুভব। ডান পা দিয়ে ঘোড়াগুলোকে ছড়িয়ে দিতে থাকে। মুখে সমানে গালি গালাজ, শাপশাপান্ত। চেয়ে দেখে তার পায়ের কাছে স্ট্যাম্প প্যাডটা পড়ে আছে। হঠাৎ হো হো করে হাসতে লাগে রজনি। স্ট্যাম্প প্যাডটা কুড়িয়ে পাঁচিলের ওপরে রাখে। হাত তুলে সাপের মুখটা তার চোখের কাছাকাছি আনে। সাপের চেরা জিভ দু একবার লক্ লক্ করে বেরোয় কিন্তু কমজোর।

— তুঁই ঠেপা দিবি? হ্যাঁঃ! চ তুঁই ঠেপা দ্যা। হামিও দিছি। দুজনাই ঠেপা দিয়ে মরি। ইটোই প্রকৃতির নিয়ম রে। হামরা কমজোর। হামরা ডাঙ্‌ মারামারি কর্‌্যে নুচানুচি কর্‌্যে মরি আর উয়ারা দালান ঠুকুক্‌। মস্ত বড়ো দালান। হদ্‌লাং হদ্‌লাং। উয়ারা সরকারি পইসা গুলান বেনামে ল্যাক্‌ আর চ-চ হামরা মরি। ইটাই ত সমাজের নিয়ম। ইটাই নিয়ম। আঃ!

এতটা কথা বলে টের পেল মুখ থেকে শুকনো সাদা ফেনা উড়ছে। ওসব কিছু তোয়াক্কা করল না রজনি। ডান হাতে ধরা সাপের মুখ স্ট্যাম্প প্যাডের কালিতে ঘষতে লাগল। সাপের মুখটা পাঁচিলের পাথরের দেওয়ালের গায়ে ঠুকল। একবার নয় বারবার ঠুকতে থাকে। এবার বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুল খোলে স্ট্যাম্প প্যাডে ঘষে আর দেওয়ালে ছাপ দিতে থাকে। বারবার বহুবার দুটো হাত সমানে চলতে থাকে। একবার বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুল আরেকবার সাপের মাথা। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে চলতে থাকে। এর মধ্যেই রজনি পা অবশ হয়ে পা ভেঙে বসে পড়ে দুচারবার। কিন্তু আবার ওঠে। এ এক উন্মাদনা। হঠাৎ রজনি টের পায় বাতাসের গোঁঙানো দুর্বোধ্য নয়। এক বিশাল জনতার কোলাহল। এক বিশাল আন্দোলন। চেয়ে দেখে আহত ঘোড়াগুলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তার কাছাকাছি এসে জড়ো হচ্ছে। লাইন লাগাচ্ছে। তার ওপরে বসে গলে যাওয়া হাত পা বিকৃত কুষ্ঠরোগী ভিখারিরা .. বৃদ্ধ বৃদ্ধা ... শত শত অযুত অযুত .. সবাই বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুল তুলে সবলে দেওয়ালের ওপর টিপ্‌ ছাপ দিতে লেগেছে। রজনি আনন্দে কুলকুলি দিতে লাগল। হাততালি দিতে লাগল। সাপটা আর সাপ নেই বিশাল একটা দেশলাই কাঠি হয়ে গেছে। রজনি শুয়ে পড়ে বসন্তের ঝরা পাতা দুহাতে দুপায়ে করে জড়ো করে। শরীর এমনিতেই বিষক্রিয়ায় মোচড় দিতে শুরু করেছে। দেওয়ালের নিচে নিচে প্রচুর শুকনো ঝরা পাতা। রজনি নিজের অজান্তেই কোমরে গোঁজা দেশলাই বার করে। তিনবার চারবার .. পাঁচবার.. বেশ কয়েকবার চেষ্টাতে অবশেষে কাঠি জ্বলে। জ্বলন্ত কাঠি শুকনোপাতার ওপরে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। রজনির চোখ দুটো বন্ধ হবার আগে দেখতে পায় পলাশ ডাবরের আগুন পলাশ বন হেঁটে হেঁটে তার খুব কাছে চলে এসেছে।